সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচী ব্যবস্থাপনা এবং স্থানীয় সরকারের (ইউনিয়ন পরিষদ) ভূমিকা

পটভূমি

বিগত ১৫ বছরে বাংলাদেশে দারিদ্র হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও বিভিন্ন তথ্য সূত্র থেকে দেখা যায় যে দেশের প্রায় অর্ধেক জনগণ দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করছে। একটি সাবলীল আর্থিক নীতিমালা, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার এবং সুশাসনের সমন্বয়ই কেবল ১৯৯০ সালের দারিদ্রের হার ২০১৫ সালের মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে এনে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। দারিদ্রকে বাংলাদেশের উন্নয়নের একটি প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে মেনে নিয়ে তা মোকাবেলার কৌশল ও মজবুত ভিত্তি হিসাবে বিভিন্ন সময়ে সরকারগুলো নানাবিধ সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য দরিদ্র জনগোষ্টিকে সকল প্রকার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে সুরক্ষা দেওয়া। বর্তমানে প্রায় ৪৮টি সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কর্মসূচী হলো,

১. কাবিখা
২. কাবিটা
৩. ভিজিএফ
৪. ভিজিডি
৫. টিআর
৬. জিআর (খাদ্য)
৭. জিআর (নগদ টাকা)
৮. বয়স্ক ভাতা
৯. শারীরিক প্রতিবন্ধী পূণর্বাসন সহায়তা
১০. অক্ষম প্রতিবন্ধী সহায়তা কার্যক্রম
১১. দরিদ্র মা'দের মাতৃত্বকালীন ভাতা
১২. বিধবা এবং স্বামী পরিত্যক্ত মহিলাদের ভাতা
১৩. দূর্যোগ-পরবর্তী দরিদ্রদের সহায়তা ভাতা
১৪. মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা
১৫. বাস্তুহারাদের জন্য গৃহায়ন তহবিল
১৬. এসিডদগ্ধ মহিলাদের পূণর্বাসন তহবিল

এ কার্যক্রমগুলো মূলত খাদ্য ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন বিভাগের অধীনে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। মন্ত্রণালয়গুলো উল্লেখিত সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচীর প্রায় সবগুলোই স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে বা সহযোগিতায় বাস্তবায়ন করে থাকে।

সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচীর সামগ্রিকভাবে চারটি উদ্দেশ্য রয়েছে। প্রথমত: জনগোষ্টীর বিভিন্ন বঞ্চিত অংশের জন্য বিশেষ বিশেষ ভাতা প্রদান যাতে দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষ দারিদ্রের কষাঘাত মোকাবেলায় কিছুটা হলেও সক্ষমতা লাভ করে। দ্বিতীয়ত: দারিদ্র নিরসনের ক্ষুদ্র ঋণ ও বিভিন্ন তহবিল ব্যবস্থাপনা ও কর্মসূচীর মাধ্যমে কর্মসৃজন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন। তৃতীয়ত: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা খাদ্য নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম। এবং সর্বোপরি দারিদ্রকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার সক্ষমতা অর্জনে নতুন প্রজন্মকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ এবং কারিগরি বিষয়ে সহায়তা প্রদান।

বাস্তব চিত্র

২০০৯-১০ অর্থ বছরে সামাজিক নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়ন খাতে উন্নয়ন ও রাজস্ব বাজেটের প্রায় ১৫.০২ শতাংশ সম্পদ যা জিডিপি'র প্রায় ২.০৫ শতাংশ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ইতিমধ্যে সরকার ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে এই বরাদ্দকৃত অর্থ ও খাদ্য সহায়তার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বিতরণ করছে। তৃণমূলে বণ্টন প্রক্রিয়ার সাথে ইউনিয়ন পরিষদ জড়িত থাকলেও অর্থ ও খাদ্য সামগ্রী বণ্টনের নীতি বা প্রক্রিয়া মূলত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রশাসনের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে। বরাদ্দ ও অনুদান বিতরণের বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে অনিয়ম, দূর্নীতি, দলীয় প্রভাব ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হওয়ার নানা তথ্য গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। বিতরণের দায়িত্বে থাকার কারণে সাধারণত ইউনিয়ন পরিষদের জনপ্রতিনিধিদেরকেই এর জন্য মূলত: দায়ী বলে মনে করা হয় কিন্তু মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনের অনিয়ম ও দুর্নীতি এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বসহ অন্যান্য নিয়ামক শক্তিগুলো ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়। অসহায়, দরিদ্র, অস্বচ্ছল, প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য বরাদ্দকৃত সাহায্য বণ্টনের এই অব্যবস্থাপনার চিত্র বছরের পর বছর ধরে বাংলাদেশে চলে আসছে। এর ফলে একদিকে যারা প্রকৃত

সাহায্য পাওয়ার উপযোগী তারা সাহায্য না পেয়ে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর অবস্থায় নিপতিত হচ্ছে। ডেমক্রেসিওয়াচ ২০০৬ সাল থেকে জনগণের দরবার প্রকল্পের মাধ্যমে ২৮টি ইউনিয়নে জনপ্রতিনিধি এবং জনগণের সাথে সরাসরি কাজ করতে গিয়ে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচীর যে বিষয়গুলো বার বার চ্যালেঞ্জ হিসেবে মনে করছে তার কিছু উল্লেখযোগ্য দিক তুলে ধরা হলো:

১. দেশের বৃহৎ জনসংখ্যার সামান্য অংশকে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচীর আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। অধিকাংশ দরিদ্র জনগণ এখনও এর আওতায় আসে নি কিংবা সুফল পাচ্ছে না।

২. জাতীয়ভাবে এলাকাভিত্তিক অতি দরিদ্র, দরিদ্র ও প্রকৃত সহায়তা প্রার্থীর সমন্বিত তালিকা/ ডাটাবেজ না থাকায় প্রতি বছর একেক প্রকল্পের জন্য নতুনভাবে স্বল্প সময়ে তালিকা প্রস্তুত করায় তা ত্রুটিপূর্ণ হচ্ছে এবং নানা সামাজিক সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

৩. সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচী বাস্তবায়নে রাজনৈতিক/ দলীয় প্রভাব। যখন যে দলই ক্ষমতায় আসে সে দলের লোকেরা সুবিধাভোগী চিহ্নিতকরণ থেকে শুরু করে তালিকা তৈরী ও বণ্টন প্রক্রিয়ায় এমনভাবে হস্তক্ষেপ করে যে প্রকৃত দরিদ্র/ সহায়তা প্রার্থীরা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে।

৪. সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচীগুলো সৃজনশীল (ওহহড়াধঃরাব) না হওয়ায় অনেক কর্মক্ষম উপকারভোগী ব্যক্তিরা কর্মবিমূখ হয়ে পড়ছে, ফলে গ্রামাঞ্চলে কৃষি শ্রমিকের অভাব দেখা দিচ্ছে।

৫. সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচীতে সম্পৃক্ত জনপ্রতিনিধিদের তথ্য গোপন করা এবং দুর্নীতির প্রবণতা।

৬. দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা নারী কিন্তু সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচী বাস্তবায়নে নারীদের বিশেষ করে নারী জনপ্রতিনিধিদের উপেক্ষা করা হয় ফলে জনগোষ্ঠির একটি বৃহৎ অংশ অরক্ষিত হয়ে পরছে। তাছাড়া প্রতিবন্ধী, সংখ্যালঘু, উপজাতি ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠিরাও এসব রাষ্ট্রীয় সুবিধার ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে।

৭. সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচীর অদক্ষ ব্যবস্থাপনা বিশেষত: প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও আপদকালীন বিলম্বিত বাস্তবায়ন।

৮. সরকারিভাবে সুষ্ঠু মনিটরিং ও পর্যালোচনার অভাব।

৯. সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের সমন্বয়হীনতা।

সুপারিশ

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নির্ভর করে বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রশাসনিক দক্ষতা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঝুঁকি ও উপকারভোগী চিহ্নিতকরণ পদ্ধতি, সাহায্য প্রদানের প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ইত্যাদির উপর। এ লক্ষ্যে কিছু সুপারিশ বিবেচনা করা যেতে পারে,

১. যে সকল মন্ত্রণালয়ে সামাজিকনিরাপত্তা মূলক কর্মসূচীর সাথে সম্পর্কিত তাদের মধ্যে একটি সমন্বিত জাতীয় নীতিমালা/ বিধিমালা থাকা প্রয়োজন এর ফলে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে অর্থ সংস্থান একটি সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে।

২. সমস্ত সহায়তা বণ্টন উপকারভোগী চিহ্নিতকরণে জনপ্রতিনিধিদের প্রাধাণ্য দিতে হবে। এবং জাতীয়ভাবে এলাকা ভিত্তিক নারী, সংখ্যালঘু, উপজাতি ও ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠিকে বিবেচনায় এনে অতি দরিদ্র, দরিদ্র ও প্রকৃত সহায়তা প্রার্থীর সমন্বিত তালিকা/ ডাটাবেজ প্রণয়ন করা এবং তা প্রতি বছর হালনাগাদ করা জরুরী।

৩. ভৌগোলিক এবং কৃষিতে পরিবেশগত ঝুকি (নদী ভাঙ্গন, লবণাক্ততা এবং আর্সেনিক) বিবেচনায় এনে সহায়তামূলক কর্মসূচীর আগাম এবং অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পনা করা প্রয়োজন।

৪. দারিদ্র্যের লিঙ্গগত বৈষম্যকে বিবেচনায় এনে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচী পরিকল্পনা করা উচিত।

৫. ইউনিয়ন পরিষদ আইন ২০০৯ এর ওয়ার্ড সভা থেকে উপকারভোগীদের চুড়ান্ত অগ্রধিকার প্রস্তুতকৃত তালিকা কে প্রাধাণ্য দিতে হবে।

৬. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী সকল যাচাই-বাছাই বরাদ্দ বণ্টন প্রক্রিয়া থেকে রাজনৈতিক সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণ বাদ দিতে হবে।

৭. ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পরিষদের (যদি গঠন করা হয়) মধ্যে একটি সম্বনিত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। যার আলোকে সকল সাহায্য সহায়তা স্থানীয় চহিদাকে প্রধাণ্য দিয়ে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়নে কাজে লাগানো যাবে।

৮. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর সকল বরাদ্দ পর্যায়ক্রমে ইউপিকে দিতে হবে, এ ক্ষেত্রে প্রশাসনিক সহায়তাকে আরো স্বচ্ছ ও গতিশীল করতে হবে।

৯. প্রকল্প বাস্তবায়ন ও সহায়তা বণ্টনে নারী প্রতিনিধিদের কার্যকর ভূমিকা এবং অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

১০. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর বিভিন্ন পণ্য সংরক্ষণ, পরিবহন ও সাহায্য বণ্টনের ব্যয় সংকুলানে ইউপিকে পৃথক বরাদ্দ দিতে হবে।

১১. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী সকল বরাদ্দ ও উপকারভোগী যাচাই-বাচাই ও বণ্টনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারিভাবে নিয়মিত মনিটরিং ও পর্যালোচনার উদ্যোগ নিতে হবে।

১২. স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারিভাবে গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তামূলক উদ্যোগের সমন্বয় করতে হবে।

১৩. একটি স্বাধীন স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন এবং তার অধীনে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচীর বরাদ্দ ও বণ্টন তদারকির উদ্যোগ নিতে হবে।

ডেমক্রেসিওয়াচ
৭ সার্কিট হাউস রোড, রমনা, ঢাকা ১০০০।
dwatch@bangla.net, www.dwatch-bd.org